নৌকা চড়ে মেঘনা পাড়ি

কাজী জহিরুল ইসলাম

তখন আমি মাত্র স্কুল ছেড়েছি। গ্রামের নরোম কাদায় তখনো ভালোবাসার শেকড় বেশ শক্তভাবেই প্রোথিত। শহুরে আটপৌরে জীবনের যাঁতাকলে পড়ে তা একটু একটু করে ঢিলে হতে শুরু করেছে। সেটা আশির দশকের মাঝামাঝি একটা সময়। লম্বা ছুটি কাটাতে গ্রামে যাচ্ছি। হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট জনজীবনের প্রতি এক ভীতিকর রাজনৈতিক অত্যাচার। এ অত্যাচারের শিকার হয়নি কে? নরসিংদী লঞ্চঘাটে পৌছে দেখি লঞ্চ শ্রমিকদের ধর্মঘট। এই ধর্মঘট আমার উচ্ছাসকে দমাতে পারে নি। আমি চেপে বসি একটি ইঞ্জিন নৌকায়। এই প্রথম নৌকায় চড়ে মেঘনা পাড়ি দেওয়া।

যদিও আমি কোনকালেই দীর্ঘ সময়ের জন্য গ্রামে থাকিনি। আমার জন্মের জন্য মা-কে তার মাতুলালয় খাগাতুয়া গ্রামে যেতে হয়েছিল। এটাই প্রথা, মেয়েরা প্রথম সন্তান প্রসব করে তার বাপের বাড়িতে। সে কারণেই বোধ হয় খাগাতুয়া গ্রাম হয়ে গেল আমার অবধারিত জন্মদাগ। গ্রাম বলতে আমি আসলে খাগাতুয়াকেই বুঝি। শৈশব-কৈশোরের বেশ কিছু দুরন্ত সময় আমি কাটিয়েছি এই গ্রামে। খাগাতুয়া গ্রামের প্রতিটি পাখি, প্রতিটি গাছের পাতা, প্রতিটি পুকুর, প্রতিটি গাছের খোড়ল, প্রতিটি গোহালের গরু-বাছুর এবং প্রতিটি ডোবা-নালার মাছের সাথে ছিল আমার আত্মীয়তা। একটি বাছুর গোপাটে হেঁটে যেতে দেখলেই আমি বলে দিতে পারতাম, ওটা কালনের দোহারা গাইয়ের বাছুর। এমন পরম আত্মীয় যে গ্রাম, ছুটি কাটাতে আমি ওখানে যাবো না তো কোথায় যাবো? ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানায় অবস্থিত খাগাতুয়া গ্রাম। ভাটি অঞ্চলের এই গ্রামটি নানান কারণে আমার কাছে ছিল বেশ রহস্যময়। সব গ্রামেই একজন করে চোর আর একজন করে পাগল থাকে কি-না জানি না, তবে খাগাতুয়া গ্রামে ছিল। জীবন (জীবইন্যা চোরা) চোর কখনোই নিজ গ্রামে চুরি করতো না। তা সত্বেও গ্রামের কারো বাড়িতে অতি সামান্য কিছু চুরি হলেই জীবনকে ধরে আনা হতো। একবার স্কুলের মাঠে বাঁশডলা দেওয়া হলো জীবনকে। চোর কি জানোয়ার? জীবন সাথে সাথে কাপড়ে পায়খানা করে দিল। সেই নির্মম দৃশ্যটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। ওর বিকৃত মুখ আর গগনবিদারী চিৎকারে আমার বুক ভেঙে কান্নার হেচকি উঠতে লাগলো। একদিন খাগাতুয়া গ্রামে ডাকাত পড়ে। গ্রামবাসী টের পেয়ে যায় গ্রামে ডাকাত ঢুকেছে। কোচ দিয়ে একজন ডাকাতকে গেথে ফেলে গ্রামের সাহসী যুবক শাহালম। কোচের কাটা পিঠে নিয়ে ছুটছে ডাকাত, কেউ একজন পেছন পেছন ছুটছে ডাকাতের। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ডাকাতকে ধরে ফেললো এক দুঃসাহসী গ্রামবাসী। কে এই দুঃসাহসী? এই গ্রামবাসীর নাম জীবন চোর। সহকারীকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া ডাকাতদল অবশেষে গুলি ছোঁড়ে কাটা রাইফেল থেকে। সেই গুলিতে মারা যায় জীবন। নিজের জীবন দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইলো জীবইন্য চোরা? এই লোকটি সত্যি সত্যি কোনকালে চোর ছিল কি-না কে জানে?

কিন্তু চোর সাব্যস্ত করে ওকে যখন প্রায়শই গ্রামের বাজারে অথবা স্কুলঘরের আঙিনায় জুতো মারা হতো, ও কখনোই এর প্রতিবাদ করতো না। মাঝে মাঝে শুধু ব্যথায় কঁকিয়ে উঠতো।

ছোটবেলায় শুনতাম, খাগাতুয়া গ্রামের খান হাটির জনৈক চুনু আমেরিকার খুব বড় একজন বিজ্ঞানী। কি তার অফিশিয়াল নাম, তা আমি যেমন জানি না, গ্রামের অনেকেই জানে না। এ-ও শুনেছি, চুনু এখন পৃথিবীর সেরা চারজন বিজ্ঞানীর একজন। দারোগা বাড়ির এক ছেলে ছোটবেলায় দেশ ছেড়ে তুরস্কে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি আরফেন্দি পরিবারে বিয়ে করেন। একদিন নাকি তিনি তুরস্কের অর্থমন্ত্রীও হন। কিন্তু ভদ্রলোকের কি নাম আমি কোনদিন জানতে পারিনি। এই গ্রামের অনেকেই রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, জেনারেল হয়েছেন, পুলিশের বড় কর্মকর্তা হয়েছেন। ফুটবলার এবং পরে জাতীয় দলের কোচ গোলাম সরোয়ার টিপু এবং এই প্রজন্মের ক্রিকেটার এবং জাতীয় দলের সাবেক ক্যাপ্টেন দূর্জয়ও এই খাগাতুয়া গ্রামেরই ছেলে। এমনি অসংখ্য সাফল্যের গল্পে গাথা খাগাতুয়া গ্রাম। আমি ছেলেবেলায় খুব গর্ব অনুভব করতাম, এইরকম একটি গ্রামে আমার জন্ম হয়েছে বলে।

রোদ মুছে গিয়ে আকাশে মেঘ দেখা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হালকা ঝড় শুরু হলো। আষাঢ়ে আকাশের এটাই চরিত্র। মেঘনা তখন উত্তাল। আমি ভালো করে সাঁতারও জানি না। নৌকা ডুববে না-তো? আমার অস্থিরতা দেখে স্থানীয় মুরুব্বিরা সাহস দিচ্ছেন, ডরাইয়ো না মিয়া, কিচ্ছু ঐতো না। কোন গাঁও যাইবা? আমি বলি, খাগাতুয়া। তুমি কার পুত? আমি বলি, রুস্তম কাজীর নাতি। একজন মুরুব্বী নৌকার ছৈয়ার ভেতর দিয়ে সাবধানে আমার কাছে এগিয়ে আসেন। আমি ডিকচাইলের রুসমত সদাগর। তোমরার আগের গাও। বান-তুফানরে ডরাইলে ঐবো? তোমরা শহৈরা পোলাপাইন ঐছো পাট-ডরাইল্লা। লও গান দরি। ‘ হাঁটু জলে নেমে কৈন্যা হাঁটু মাঞ্জন করে...গো.....হাঁটু মাঞ্জন করে....’।

রুসমত সদাগরের গানের সুর মেঘনা নদীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দূরে পালতোলা নৌকাগুলো থেকেও ভেসে আসছে গানের সুর। এই মেঘনা এর আগে বহুবার পার হয়েছি। কিন্তু আর কখনোই ঢেউয়ের জিভ আমার গায়ে ছোবল মারেনি, মেঘনার কালো জলে আমার সাহস ভিজেনি। বাতাস বাড়তে থাকে। ঢেউ উঁচু হতে থাকে। নৌকার দুলুনি বাড়তে থাকে। আমার ইচ্ছে হয় রুসমত সদাগরকে বলি, নানা গান থামান। আজান দেন। আজান দিলে ঝড়-বাদল কেটে যায়। আজান দিলে ঝড়-বাদল কেটে যায় কি-না জানি না, আমার নানাজানকে দেখতাম ঝড়ের গতি বেড়ে গেলে দুটো কাজ করতেন। একটা দা হাতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়ে গোহালের গরুগুলোর দরি কেটে দিতেন। তারপর ঘরে ফিরে সজোরে আজান দিতেন। নানাজানের আজানের ধ্বনি প্রায়শই ঝড়ের তান্ডবের কাছে ম্লান হয়ে যেত। তিনি গলা আরো চড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। যেন ঝড় আর মানুষের মধ্যে চলছে পালাগানের লড়াই।

রুসমত সদাগর গান থামান না। গান বদলান। এবার তিনি মারফতি গান ধরেন। সেই গানে গলা মেলায় রুশন বেপারি, ঝাড়ু মেম্বার আর বাশু মিয়া। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে কাঁপছে। ইঞ্জিন নৌকাটি দশ/পনের ফুট ওপরে উঠে আবার আছড়ে পড়ছে। মেঘনায় সলিল সমাধি। আগামীকাল হয়ত এরকম একটা খবর

বেরুবে কাগজে। পানির নিচে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু। কেমন হবে সেই মৃত্যু? কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে অনুভব করার চেষ্টা করি।

একসময় ঝড় কেটে যায়। মেঘনা এখন একদম শান্ত। ঝড় থেমে গেলে নদীগুলো কি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শান্ত হয়ে যায়? নাকি ঝড়ের দাপট দেখতে দেখতে স্বাভাবিক অবস্থাকে বেশি শান্ত মনে হয়? বুঝতে পারি না। আমরা মানিকনগর ঘাটে এসে পৌছাই বিকেল পাঁচটায়। বাশু মিয়া অজু সেরে নামাজে দাঁড়ানোর আগে দাড়ি খিলাল করছেন। রুসমত সদাগর আমাকে ডাকলেন, লও নাতি টানো যাই। গাডের মিষ্টি খাওয়াইছেনি তোমার নানায়? জবর স্বাদ, খাডি ছানার মিষ্টি। আমি রুসমত সদাগরকে অনুসরণ করি। ভারি মজার এক চরিত্র। এতোবড় দারি রেখেছেন কিন্তু নামাজ পড়েন বলে মনে হয় না। মাঝি জানালো, আদাগন্টার বিরতিগো পেসেঞ্জার বাই-বৈনেরা। ছোড কাম-বড়কাম যার যা আছে সাইরা লন চালাইয়া। সাড়ে পাঁচটায় নাও ছাড়বো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯, ডিসেম্বর ২০০৬